International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 92-95
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় প্রতিফলিত কর্মযোগ চিন্তন

অনিমা সাহু
স্বাধীন গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In this world each and every human being has their own work and no one can live without work. However, which types of work they have to perform have been mentioned by Lord Krishna in 'Bhagavad Gita'. Lord Krishna explained 'Karma Yoga' when Shri Arjun wanted to exit from the battlefield. Here, the word 'Karma' means work or action and 'Yoga' means generally meditation or some breathing exercises. But in Bhagaved Gita 'Yoga' means the skill of union. Without any intention nobody can perform any action. It means to get some result out of that action we are performing. According to the 'Bhagavad Gita' 'Karma Yoga' refers to all human duties or activities performed without any desire or any attachments or expectation. In this research work we have discussed the importance of duties and responsibilities in every human being.

Keywords: Bhagavad Gita, Karma, Yoga, Karmayogi, Nishkam Karma

ভূমিকা: হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হল শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা। সেই প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাস পুরাণাদির বহুস্থানে গীতার অপার মহিমা বর্ণিত হয়ে আসছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত দিব্যবাণী হল শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা। এই পরম রহস্যময় গ্রন্থে সকল শাস্ত্রের নির্যাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের তাৎপর্য এতই গূঢ় এবং গভীর যে আজীবন নিরন্তন চিন্তন মনন করলেও এর অন্ত পাওয়া যায় না। সকল শাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ গীতার মাধ্যমেই সম্ভব। মহাভারতে বলা হয়েছে—

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌ বিনিঃসৃতা।।'[১]

অর্থাৎ স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের মুখনিঃসৃত এই বাণীর সঠিক শ্রবণ মনন, চিন্তন করলে অন্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন হবে না। সর্বমঙ্গলময়ী এই গীতা এমন একটি দর্পণ যার মাধ্যমে সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

অজ্ঞানবশতঃ জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। সেই অজ্ঞ জীব যাতে সাংসারিক কর্তব্য কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে তার উপদেশ পাওয়া যায় গীতায়। জীবকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করেছেন। এবং তাঁর উপদেশের মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছেন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি – এই তিনটি কিভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা যুক্তি সম্ভব ঠিক কিন্তু সেই দুর্গম জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করার আগে জীবকে কর্ম ও উপাসনা করতে হবে। সেই কর্ম কিরূপ হবে অর্থাৎ জীবের কর্তব্যকর্ম কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়টি এই গবেষণা পত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। জীব প্রত্যেকটি মুহূর্তে কোনো না কোনো কর্মের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু সমস্ত কর্মের দ্বারা পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয় না বা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কর্মের কথা

বলেছেন সেটি হল নিস্কাম কর্ম অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কৃত কর্ম হল নিস্কাম কর্ম। এই নিস্কাম কর্মের দ্বারাই জীব সংসার সাগর অতিক্রম করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে কিভাবে সেই কর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ নিস্কাম কর্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই বিষয়টি আলোচ্য গবেষণাপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার গীতোক্ত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কিভাবে ও কেন, কর্মযোগ-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় – সেই বিষয়টিও এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

কর্মযোগের স্বরূপ বিশ্লেষণ:

'কর্ম' শব্দের দ্বারা কোনো কিছু কাজ করা বোঝায়। প্রত্যেকটি জীব কর্ম ব্যতীত ক্ষণকালও থাকতে পারে না। কায়িক, বাচিক বা মানসিক যেভাবেই হোক মানুষ সদাসর্বদা কোন না কোনো কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখে। জীব কর্ম করে আবার কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাও করে। তাই দুঃখ, গ্লানির মধ্য দিয়ে এই সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে সর্বদা থাকে বলে কর্ম অনুযায়ী ফল না পেলে মানুষ হতাশ হয়, দুঃখ পায়।

তাই কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গনে সংসারের মোহমায়ায় আবদ্ধ অর্জুন যুদ্ধের পরিণতির কথা ভেবে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাগে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছেন। সেই অবস্থায় অর্জুনের মোহ কাটিয়ে তোলার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জীবের কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমগ্র বিশ্বকে সেই উপদেশ দিয়েছেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমগ্র বিশ্বকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন।[২] শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশে যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে সেটি মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তিলাভের উপায়। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে ক্রিয়মান কর্ম হল কর্মযোগ। হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক পথের অন্যতম একটি হল কর্মযোগ, যেটি কর্মমার্গ নামেও পরিচিত। এই কর্মযোগ ক্রিয়াযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩] নিঃস্বার্থ ভাবে এই কর্মপথের দ্বারা জীব জীবন অতিবাহিত করে মোক্ষ লাভ করে। 'কর্মযোগ' শব্দের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা, আসক্তিহীন যোগী ব্যক্তির ঈশ্বর জন্য কৃত নিষ্কাম কর্মকে বোঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কর্মযোগ বিষয়ে বলেছেন –

'কর্মযোগ মর্মকথা ঈশ্বরকে পাওয়া।
ঈশ্বরেতে মন রাখি কর্ম করে যাওয়া।।[৪]

কর্মযোগ বিষয়ে বিভিন্ন মনিষীগণ নিজেদের মত দিয়েছেন। ঋষি অরবিন্দ এ বিষয়ে বলেছেন – যে কর্ম বন্ধনের সৃষ্টি না করে মুক্তি বা জীবনের দিব্যরূপান্তর আনয়ন করে সেটি কর্মযোগ। আবার বলেছেন – অনাসক্তভাবে যে কর্ম করা হয় সেটি কর্মযোগ। এ বিষয়ে গান্ধিজীরও মত জানা যায়। তিনি বলেছেন, 'যদ্‌ দ্বারা আত্মাকে শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত করার যোগ সাধিত হয় সেটি হল কর্মযোগ।

গীতার ১৮টি অধ্যায়ে ১৮টি যোগের মধ্যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের প্রাধান্য দেখা যায়। এই তিনটির মধ্যে আবার কর্মযোগকে গীতার প্রাণস্বরূপ দেখানো হয়েছে। গীতায় তৃতীয় অধ্যায় 'কর্মযোগ' নামে খ্যাত। সেখানে কর্মযোগের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেও অন্যান্য অধ্যায় গুলিতেও কর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগের স্বরূপ বুঝিয়ে তাকে কর্মে প্রেরণ করার জন্য বলেছেন –

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোংস্ত্বকর্মণি।।'[৫]

অর্থাৎ -- 'হে অর্জুন! তোমার কর্মেই অধিকার, তার ফলে নয়। তাই তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না, আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের দ্বারা বোঝানো হয়েছে – বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব কর্ম-কর্তব্য থাকে। মানুষ সেই কর্ম অবশ্যই করবে কারণ সেই কর্মের প্রতি তার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই কর্ম করার জন্য সে কি ফল পাবে, তার কি লাভ বা ক্ষতি হবে তা জানার অধিকার তার নেই। কোনো কর্মের কি ফল হবে, সেই ফল সে কোন জন্মে কিভাবে লাভ করবে – এসব মানুষ নিজেও জানে না আর নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা পেতেও পারে না। এই সবই বিধাতার অধীন। তিনি প্রত্যেকটি জীবের জন্য কর্ম ও কর্মফল নির্দিষ্ট করে দেন। তাই ফলের কথা না ভেবে কর্ম করা উচিত। কিন্তু কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কিভাবে কর্ম করা যাবে সেই বিষয়ে উপদেশও গীতায় পাওয়া যায়

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গংত্যক্ত ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।'[৬]

উপরোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন - অর্জুন যেন কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতিতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যোগস্থ হয়ে কর্তব্য কর্ম করেন। কর্ম সিদ্ধি হলে মানুষ যেমন পরম আনন্দ লাভ করে তেমনি আবার কর্মের অসিদ্ধিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই যদি কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধির মধ্যে সমত্ব বজায় রাখা যায় তবে অনায়াসে কর্মফলের আসক্তি দূর হবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধির মধ্যে এই সমত্বকে গীতায় 'যোগ' বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যে কোনো সাধন দ্বারা যদি সমত্ব লাভ করতে পারে তবে যে যোগী হয়। সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন যোগী পুরুষ সমস্ত পাপ, পুণ্য থেকে সংসারের মায়াজাল থেকে সহজে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। এই সমত্বরূপ যে 'যোগ' সেটিকে গীতায় কর্মের কৌশল বলা হয়েছে - 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'।[৭] অর্থাৎ সমত্বরূপ যোগের দ্বারাই কর্মবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়।

প্রাচীনকাল থেকে বেদে যজ্ঞাদি বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। সেইসব কর্মের ফলও উক্ত হয়েছে, অর্থাৎ কোন কর্ম করলে কোন ফল পাওয়া যাবে তার কথাও বলা হয়েছে যেমন কোনো কোনো যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা পুত্রলাভ করা যায়, কোনটির দ্বারা আবার যজমান বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে - এগুলো বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কোনো কিছু কামনা করে এই কর্মগুলি করা হয় বলে এগুলি হল কাম্য কর্ম। এইসব কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বন্ধন নাশ তো হবেই না বরং মানুষ আরোও বেশি করে সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। এখন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন দেখা দেয়—বেদোক্ত কর্মগুলি করলে যদি মানুষ সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে তবে কি কর্ম না করাই শ্রেয়? অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন এলে ভগবান তাকে বলেছেন - কর্ম অবশ্যই করবে, তবে সেই কর্ম হবে কর্মযোগী হয়েছেন এবং কর্মযোগের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করেছেন।[১০] কারণ আসক্তি রহিত কর্মের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তার ফলে পরমাত্মার কৃপায় তার তত্ত্বজ্ঞান আপনি-ই প্রাপ্তি হয় এবং কর্মযোগী ব্যক্তি তাঁর এরূপ কর্মের দ্বারা অনায়াসে পরমাত্মাকে লাভ করে থাকেন। এটি যে ঈশ্বর লাভের স্বতন্ত্র ও নিশ্চিত পথ এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। জনকাদি মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েছেন সকল মানুষের সেই পথ অনুসরণ করা উচিত। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য করা উচিত এরূপ ভেবে কর্ম করেন না। তাঁর কর্মের দ্বারা অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিরাও যাতে উপকৃত হয় এরূপ ভেবেই কর্ম করে থাকেন - 'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।'[১১]

গীতায় ভগবান কোথাও কেবল কর্মফল, কোথাও কেবল আসক্তির কথা বলেছেন। আবার দেখা যায় ফল ও আসক্তি উভয় ত্যাগ করে আমাদের কর্তব্য কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর এই উপদেশ থেকে বোঝা যায়- - কর্মযোগীর সাধন বাস্তবে তখনই পূর্ণ হয় যখন ফল ও আসক্তি দুইয়ের ত্যাগ করা হয়। কারণ জীব কর্মফল ও আসক্তি ত্যাগ যদি করতে পারে তবেই সে জন্ম, মরণ রূপ বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং শান্তিময় পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে -

'কর্মজং বুদ্ধিযুক্ত হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।'[১২]

তাই মুমুক্ষুগণ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করার জন্য, সংসার বন্ধনকে অতিক্রম করে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য, ইহলোক ও পরলোকের ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নিস্কামভাবে নিজেদের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে থাকেন।

কর্মতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন: অর্জুন যাতে মনের ভয়, ভীতি, আশঙ্কা দূর করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেন তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার নিস্কাম কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু কর্ম কি? অকর্ম কি? বিকর্ম কি? - এগুলি জানা না থাকলে জ্ঞানীগণও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই কর্মবিষয়ক এই মোহ দূর করার জন্য ভগবান কর্মতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এই বিষয়গুলিকে সকলের কাছে প্রস্ফুটিত করেছেন। সাধারণভাবে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা কৃত সবকিছুরই নাম হল কর্ম। আবর মন, বাক্য, এবং শরীরে কর্মসকলকে ত্যাগ করাই হল অকর্ম। আর যে সব কর্ম করা উচিত নয় যেমন - ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি পাপ কর্মগুলি বিকর্ম নামে পরিচিত হয় নিস্কাম কর্ম। কর্মযোগী ব্যক্তি যদি নিস্কামভাবে কর্তব্যপালন করতে পারেন তবে তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন।

কর্ম ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তাই গীতায় উক্ত হয়েছে -

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।।'

পরমেশ্বর উপরোক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝিয়েছেন - কোনো জীবই কর্মবিহীন হয়ে থাকতে পারবে না। খাওয়া, বসা, শয়ন, জাগরণ, চিন্তন, ধ্যান করা - এ সবই কর্মের অন্তর্গত। প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা অবশ হয়ে সকল জীব কর্ম করতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ শরীর থাকবে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী জীব কোনো না কোনো কর্মের সাথে যুক্ত থাকবে। নদীর জল যেমন স্বাভাবিক

ভাবে সমুদ্রের দিকে বয়ে যায়, তার প্রবাহ জোর করে রোধ করা যায় না তেমনি সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন হয়ে, প্রকৃতির প্রবাহের দ্বারা চালিত হয়। তাই কোনো মানুষ জোর করে কর্মকে সর্বোতভাবে ত্যাগ করতে পারে না। তাছাড়া কর্ম না করলে শরীর নির্বাহ হবে না।

কিন্তু বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মগুলির দ্বারা ইষ্টলাভ হয় বলে ঐ কাম্য কর্মগুলি বন্ধনের হেতু বলে মনে করা হয়। তাই সেইসব কাম্য কর্ম বিষয়ে ভগবান আবার অর্জুনকে বলেছেন –

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো ন্যত্র লোকো য়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।"[৯]

অর্থাৎ 'যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম-ই বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তিহীন হয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত কর্তব্যকর্মকর।' অতএব বোঝা যাচ্ছে অনাসক্তভাবে যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম করেন যে সব ব্যক্তি তাঁরা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে যে কর্ম করতে প্রেরণা দিয়েছেন সেটি হল নিস্কাম কর্ম। এইরূপ কর্ম করলে মানুষের সুখ-দুঃখ রূপ কর্মফল অনুভূত হয় না। গীতায় দেখা গেছে ভগবান প্রথমে কেবল কর্মফল ত্যাগের কথা বলেছেন। পরে আবার দেখা গেছে কেবল আসক্তি ত্যাগের কথা বলেছেন। আসক্তি রহিত হয়ে নিস্কামভাবে কর্মযোগের মাধ্যমে যে পরমসিদ্ধি লাভ করা যায় এটি বোঝানোর জন্য ভগবান জনকাদি মহাপুরুষদের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন – সেই প্রাচীন কাল থেকেই রাজা জনকের মত আরো অনেক মহাপুরুষ মমতা, আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে লোকসমাজে। কিন্তু এত সাধারণভাবে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মকে জানলে কর্মতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন হবে না। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম-এর গভীর স্বরূপ নিরূপণের দ্বারা কর্মতত্ত্বের রহস্য জানা সম্ভব হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সহজে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এমনকি বিদ্যাবুদ্ধিতে পণ্ডিত বলে বিবেচ্য যাঁরা তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়ে অবগত হতে পারেন না। কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। তাই কর্মতত্ত্ব যাঁরা জানেন সেই মহাপুরুষদের থেকে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক –

'কর্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনাকর্মণো গতিঃ।।'[১৩]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন জ্ঞানী, তিনি পরমেশ্বর, তিনিই কর্ম নির্ণয় করেন। তাই তিনি অর্জুনকে কর্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম – এই তিনটির গভীর ভাবে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। এই তিনটির অন্তর্নিহিত স্বরূপর জানলে প্রকৃতপক্ষে কর্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন –

'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।'[১৪]

অর্থাৎ -- 'যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত ও সর্বকর্মকারী।' যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে যতপ্রকারের কর্ম আছে সেগুলির প্রতি আকাঙ্ক্ষা, মোহ, মায়া ত্যাগ করে জীবকে ইহলোক পরলোকের সুখ দুঃখ ভোগ করার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না এবং সে সমস্ত সংসার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে – এই রহস্য বুঝে যাওয়াই হল কর্মে অকর্ম দেখা। আবার ত্যাগরূপ অকর্ম আসক্তি, ফলেচ্ছা, মমতা ও অহংকার পূর্বক করলে পূর্বজন্মের হেতু হয় এবং কর্তব্যকর্মের অবহেলাতে সেটি বিকর্ম রূপে পরিণত হয় – এই রহস্য বোঝার নাম অকর্মে কর্ম দেখা।[১৫] যে সব ব্যক্তিরা কর্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারেন তাঁরা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম শারীরিক কষ্টের ভয়ে ত্যাগ করেন না, রাগ-দ্বেষ মোহবশতঃ মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা অথবা অন্য কোনো ফলের আশা করেন না। আবার তাঁর পুনর্জন্মের ফলেও ভাগীও হন না তাই তাঁরা বুদ্ধিমান পুরুষ বলে বিবেচিত হন। সেইসব কর্মযোগী ব্যক্তিরা কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে নিস্কামভাবে কর্মের সাধনা করেন বলে পরমাত্মাতে নিজেকে বিলীন করে দিতে সমর্থ হন।

কর্মযোগী পণ্ডিতগণ কর্মের গভীর তত্ত্ব বিষয়ে অবগত হয়ে কর্ম বন্ধনে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শুধু তাই নয়, পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎরূপে লাভ করতে পারেন। সমস্ত মোহ-মায়া ত্যাগ নিজের অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ করে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করাই সকলের কর্তব্য। কর্মযোগী সাধন কালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মাকে ও নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করেন। তাই ভগবানের দৃষ্টিতে কর্মযোগীরা শ্রেষ্ঠ।

উপসংহার:

জীব 'আমি সবকর্মের কর্তা' -- এরূপ অন্ধকার বিমূঢ় হয়ে জীব নিজেকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। শুভাশুভ কর্ম করে তার ফল পেতে চায়। আর কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে অজ্ঞাতবশতঃ সুখ-দুঃখ লাভ করে। অজ্ঞানবশতঃ কর্মফলে আসক্তি হয়ে

রাগ, দ্বেষ, গ্লানির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এটাই হল সাংসারিক বন্ধন। এই বন্ধনের জন্য জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে [১৬] এবং পরমাত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

গীতায় কর্মযোগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে – বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান এরূপ কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। কর্ম সকলের জন্যই অনিবার্য। কিন্তু সেই কর্ম এমন হবে যার দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হবে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ হবে। গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম শুধুমাত্র যোগী ব্যক্তিরাই অনাসক্ত হয়ে করতে পারেন। কেননা ইচ্ছা ত্যাগ করে বা অনাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গীতানুসারে ঈশ্বরের নিমিত্ত কৃত এরূপ কর্ম, বন্ধন উৎপন্ন না করে মোক্ষপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। কর্মফলে অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করে যে কর্মের অনুশাসন করা হয় সেটি কর্মযোগ। সেই কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়েছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে। এর মূল কথা হল শুধু কর্ম নয় যোগযুক্ত কর্ম করাই শ্রেয়। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে কিভাবে কর্মযোগী করে তুলতে পারেন সে বিষয়ে গীতায় ভগবান কি উপদেশ দিয়েছেন, সেটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। মহাভারত- (ভীষ্মপর্ব) – ৪৩/১।
২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (বাংলা) গীতাপ্রেস (গোরক্ষপুর)- পৃষ্ঠা-১।
৩। http://bn.m.wikipedia.org
৪। রামকৃষ্ণ কথামৃত।
৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা – ২/৪৭।
৬। তদেব, ২/৪৮।
৭। তদেব, ২/৫০।
৮। তদেব, ৩/৫।
৯। তদেব, ৩/৯।
১০। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বাংলা)- গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পৃষ্ঠা- ১১১।
১১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা- ৩/২০।
১২। তদেব, ২/৫১।
১৩। তদেব, ৪/১৭।
১৪। তদেব, ৪/১৮।
১৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বাংলা)- গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, পৃষ্ঠা- ১৫৭।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯১ ।

গ্রন্থতালিকা

আচার্য, শর্মা রাম – কর্মযোগ ঔর কর্মকৌশল, যুগনির্মাণ যোজনা বিস্তার ট্রাস্ট, মথুরা, ২০১০।
গান্ধী, মহাত্মা – ‘অনাসক্তি যোগ’, ডায়মন্ড পাকেট, বুক্স, নয়া দিল্লী, ২০০৯।
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ --‘শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত’, কথামৃতভবন, কলকাতা, ১৯৩২।
গোয়েন্দকা, জয়দয়াল – ‘শ্রী মদ্‌ভগবদ্‌গীতা’ (বাংলা), গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৫।
ঘোষ, অরবিন্দ – ‘গীতা নিবন্ধ’, সর্বোসেবক সংঘ, কলকাতা, ২০০০।
তিলক, বাল গঙ্গাধর – ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রহস্য অর্থাৎ কর্মযোগে শাস্ত্র’, ৫৬৮, নারায়ণপীঠ, লোকমান্য তিলক মন্দির- ৪১১০৩০।
রায়, প্রতাপচন্দ্র – ‘মহাভারত’, কলকাতা, ১৮৮৭।
শাস্ত্রী, কৃষ্ণশঙ্কর – ‘ভগবত্‌ পুরাণ’, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ১৯৪৫।

অন্তর্জাল

http://bn.m.wikipedia.org